নিবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ অন্য চোখে

তরুণকুমার দে

পূর্বানুবৃত্তি

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ একসময়ে শাস্ত্রীয় বিধিমতে চৌষট্টি প্রকার তন্ত্রসাধনা করেছিলেন। তান্ত্রিক বললেই আমাদের মনের মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নরবলি প্রদানকারী পিশাচ-সদৃশ এক ভীমকায় মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে। তন্ত্রের উৎপত্তিকালে তান্ত্রিকদের এই রূপ ছিল না। তন্ত্র সর্বধর্মসমন্বয় এবং পদদলিত মানুষের মুক্তি তথা উত্থানে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। তন্ত্রসাধনাকালে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কাপালিকসুলভ ভয়াবহতা কখনোই ফুটে ওঠেনি। বরং প্রশান্ত, সৌম্য, সদাশয় ও ক্ষমাশীল রূপেই তাঁকে দেখা গেছে। কেন তিনি তন্ত্রসাধনার দিকে ঝুঁকেছিলেন, তার একটা ব্যাখ্যা (সেটা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী অনুসারে সত্য নাও হতে পারে) ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত পালায় রাখা হয়েছিল—

''রামকৃষ্ণ॥ তন্ত্র বড় ভাল জিনিস গো। ধর্মের নামে মেয়েদের ওপর অত্যাচার, হাঁড়ি-ডোম-দুলেদের দুপায়ে মাড়ানো আর যেসব জ্ঞানী মানুষ উল্টো কথা বলবে, তাদের হ্যানস্তা করার পাল্টা ধাক্কা তো ঐ তন্ত্রই দেয়।''

বস্তুত, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা লক্ষ্য করি, তিনি মানুষকে ভালবাসাতে এবং দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে উৎসাহ দিয়েছেন। নিজেও দাঁড়িয়েছিলেন সমাজের ঘৃণ্য পতিতা এবং নিন্দিত মদ্যপ অভিনেতাদের পাশে। পালাকারের ব্যাখ্যা ঐ দিকটিই নির্দেশ করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে যিনি অদ্বৈত সাধনা শিখিয়েছিলেন, সেই সাধু তোতাপুরীর একসময়ে কঠিন রক্ত আমাশা হয়েছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিনি গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গঙ্গায় নামলেও তাঁর হাঁটুর ওপরে জল ওঠেনি। ফলে আত্মহত্যা করাও সম্ভব হয়নি। কিন্তু পালার মধ্যে তোতাপুরীর অসুখ এবং আত্মহত্যায় ব্যর্থতার কারণ অন্যভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল ঃ

''রামকৃষ্ণ।। পাঞ্জাবের আবহাওয়া রুক্ষ। তোমার শরীরের গঠন সেইসঙ্গে মিলিয়ে হয়েছে। এখানকার বাতাস-মাটি-জল সবই অন্যরকম। তোমার তা সহ্য হবে কেমন করে? তাই পেটের অসুখ করেছে।... গঙ্গায় কেনে ডুবতে পারনি জান?... তুমি যে সাঁতার জান গো। রোগের জ্বালায় ডুবতে গেছ ঠিকই। আবার তোমার অজান্তেই তোমার হাত-পা নড়েচড়ে তোমাকে ভাসিয়ে তুলেছে।''

প্রাকৃতিক কতকগুলি ব্যাপার আছে, যা মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে মানুষের মনে অসহায়তা জন্ম নেয়। যেসমস্ত ঘটনাকে মানুষ ব্যাখ্যা করতে পারে না বা মেনে নিতে পারে না, তাদের বশে আনার জন্য সে সর্বশক্তিমান কারো সাহায্য চায়। সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হতে পারেন অথবা হতে পারেন কোন ধর্মগুরু। ঈশ্বর ধরাছোঁয়ার বাইরে হলেও ধর্মগুরু সহজলভ্য। কোন কোন ধর্মগুরু আবার তাবিজ-কবচ-যাগযজ্ঞ করে শরণাগত মানুষের মনের বিভ্রান্তি আরো বাড়িয়ে দেন। আবার মুষ্টিমেয় ধর্মযাজক আছেন, প্রত্যেক যুগেই ছিলেন, যাঁরা মৃত্যুকে সহজভাবে নিতে শিখিয়েছেন, জরাকে অনিবার্য বলে মেনে নিতে বলেছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে অবশ্যম্ভাবী বলে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা থেকে বাঁচার রাস্তাও দেখিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ দ্বিতীয় শ্রেণির মহামানব ছিলেন। পালাকার তাঁর মুখ দিয়ে তোতাপুরীর আত্মহত্যায় ব্যর্থতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তোতাপুরীর অসুস্থতার কারণও বিশ্লেষণ করা হয়েছে ঐ সংলাপে।

পালার আরেক জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে একটি সংলাপ বসানো হয়েছে। হুবহু ঐকথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো বলেননি, কিন্তু তাঁর বাণীগুলি ব্যাখ্যা করলে ঐ সুরটিই ধরা পড়ে ঃ

''রামকৃষ্ণ।। এ পৃথিবীতে কত কি জানবার আছে, তার কতটুকু আমরা জানতে পেরেছি! সেই নিয়ে অহঙ্কার! কেউ আমরা কিচ্ছু জানি নে...''

বাস্তবিক, শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রে এই জানার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাই তন্ত্রসাধনার পরে অদ্বৈতসাধনার পথে পা বাড়িয়েছিলেন, পরে ইসলামধর্ম এবং খ্রিস্টধর্মকেও জেনেছিলেন, ব্রাহ্মদেরও ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন।

কঠোর বাস্তববাদী শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, যাত্রাজগতে অভিনেতার পক্ষে মদ্যপান অস্বাভাবিক নয়। এও তিনি বুঝতেন, মদ্যপান যার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তাকে মদ ছাড়াতে চাইলে হয় ব্যর্থ হতে হবে, নয়তো নেশাসক্ত মানুষটি অসুস্থ হয়ে পড়বে। যে-শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রসাধনার সময়ে তান্ত্রিক কারণ (অর্থাৎ মদ্য) স্পর্শ করেননি, 'মাতাল' গিরিশচন্দ্রকে তিনিই সাদরে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। শুধু উপদেশ দিয়েছিলেন (পালার সংলাপে) ঃ
''মদ খাবি তো খা, মদ যেন তোকে না খায়।''

সেইসঙ্গে গিরিশচন্দ্রকে তিনি রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কোনসময়েই লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে বা পাহাড়ের গুহায় বসে ঈশ্বরচিন্তা করার প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেননি। বরং তিনি বারবারই বলতেন ঃ ''যত্র জীব, তত্র শিব।'' প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিও তাঁর 'বহুজনহিতায়' কাজ করার নির্দেশ ছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে অনুকরণীয় বহু বিষয় রয়েছে, রয়েছে পার্থিব মানবসমাজের ব্যবহারের উপযোগী অমোঘ সত্য। ঐসব সত্যগুলিকে নব্য মতবাদ কখনো কোণঠাসা করতে পারেনি। তবে কালভেদে প্রকাশভঙ্গি পাল্টাতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণও বহু ধর্মশাস্ত্রের সারসংক্ষেপ সহজ সরল ভাষায় যুগোপযোগী করে পরিবেশন করতেন।

পালায় আছে, মদ্যপান করে গিরিশচন্দ্র বিস্মিত হয়ে বলছেন ঃ ''এ বোতলে যে মদ ছিল, সিরাপ হলো কি করে?'' ম্যাজিক-বিরোধী শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁকে সম্ভাব্য বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দিচ্ছেন পাল্টা প্রশ্ন করে ঃ ''আজ বুঝি অনেক দাম দিয়েছিলি?'' পরবর্তী কালে দেখা গেছে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কর্মবিমুখ অলস মানুষকে ক্ষাত্রবীর্যে প্রতিষ্ঠিত করতে গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেলাকে শ্রেয় বলেছেন এবং তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বিপ্লবীদের যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বিবেকানন্দের যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাভাবনাকে উৎসাহ দিতেন, বিবেকানন্দও তেমনি নিবেদিতার মধ্যে যুক্তিনির্ভর ধর্মবোধকে জাগিয়ে তুলেছিলেন।

কথিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের রোগমুক্তির আশায় শ্রীমা সারদাদেবী তারকেশ্বরের মন্দিরে 'হত্যা' দিয়েছিলেন। পালার শেষদিকে সেই প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু পরিবেশনা ছিল অন্যরকম। অন্তত অন্য ইঙ্গিতবহ।

''সারদা।। আমায় তারকেশ্বরে যাবার অনুমতি দেবে না তুমি?

রামকৃষ্ণ।। তোমার কি মনে হয় ঐখানে হত্যে দিলেই আমার অসুখ সারবে? তা যদি হতো, তাহলে মহেন্দ্র সরকার তৈরি হতোনি।''

এমন কথা শ্রীরামকৃষ্ণ আদৌ বলেননি, কিন্তু অসুখকে তিনি সহজভাবেই মেনে নিয়েছিলেন। রোগযন্ত্রণাও তিনি সহ্য করেছিলেন হাসিমুখে। প্রশান্তির সঙ্গে অনিবার্য মৃত্যুকে তিনি হাসিমুখে বরণ করেছিলেন। পালার উল্লিখিত সংলাপটিতে বাস্তববাদী শ্রীরামকৃষ্ণের রোগের জন্য অলৌকিক কিছুর বদলে শিক্ষিত চিকিৎসককেই গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ধর্মসাধনা প্রকৃতপক্ষে মানুষকেন্দ্রিক ছিল। সেইদিক থেকে পালাকারের বক্তব্য অনেকটাই বাস্তবনির্ভর।

সহজ ব্যাখ্যা

বুদ্ধদেব পালি ভাষাকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর প্রচারের মাধ্যম হিসাবে। চৈতন্যদেব বেছে নিয়েছিলেন বাঙলা ভাষাকে। একটাই কারণ—সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করা। কিন্তু এটাও সত্য যে, 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'। শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ কথা তো বটেই, অত্যন্ত দুরূহ তত্ত্বেরও সাদামাটা ভাষায় সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আগে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির পা ভাঙা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপ ছিল ঃ ''দেবতাকে পুতুল বলে মনে কচ্ছ কেনে? সেও তো একদিন মাটির মানুষই ছিল। গুণ আছে বলে তাকে দেবতা বলা হয়েছে।''

এখানে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে যে, সদ্‌গুণসম্পন্ন মানুষে পরবর্তী কালে দেবত্ব আরোপিত হয়। বাস্তবে শ্রীরামকৃষ্ণ এমন কথা না বললেও এটা সত্যি, প্রায়-নাস্তিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন তাঁর চারিত্রিক গুণ লক্ষ্য করেই। পালাকার বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপে ঐজাতীয় কথা লিখেছেন। সম্ভবত যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁদের কাছে পালাকার তাঁকে একজন মহামানবরূপেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর অনুগামীদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথই সবচেয়ে বড় সংগঠক। এও তিনি জানতেন, নরেন্দ্রনাথের নতুন তত্ত্ব গ্রহণের ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি; আবার পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—অনেক কিছুই নরেন্দ্রনাথ সহজে গ্রহণ ও বর্জন করতে সক্ষম। সেই কারণেই নরেন্দ্রনাথ হিন্দুশাস্ত্রের বিচারে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে এলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। বিষয়টি পালাকার এইভাবে লিখেছেন ঃ

''রামকৃষ্ণ।। অখাদ্য বলে জগতে কিছু নেই জানবি। দেশভেদে জলবায়ু ভেদ; মানুষের শরীরেও সেইরকম নানা খাদ্যাখাদ্য সয়, আবার সয় না। বাঘ কি ঘাস খেয়ে বাঁচতে পারে? গরুকে যদি মাংস খাওয়াতে যাস, সে কি খাবে? না, খেলেও তার শক্তি বাঘ-সিঙ্গীর মতো হবে?''

প্রখর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের শক্তি পরিমাপ করতে ভুল করেননি। তাঁর প্রয়াণের পরে স্বামীজী গোটা পৃথিবী জুড়ে যে কর্মযজ্ঞের সূচনা করে গিয়েছিলেন, আজও তা মহিমোজ্জ্বল। সেদিন যদি শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের আচার-আচরণকে কঠোরভাবে

নিয়ন্ত্রণ করতেন, তাহলে আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে পেতাম কিনা সন্দেহ।

মানবধর্মের সন্ধানে

'পুজো' শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে একটা ছবি ভেসে ওঠে। একটা প্রতিমা থাকবে, তার সামনে থাকবে নৈবেদ্যের স্তূপ, জ্বলবে সুগন্ধি ধূপ, ধুনোর গন্ধে ভরপুর থাকবে চারপাশ। ইলেকট্রিক বাল্ব থাকলেও প্রদীপ জ্বলবে। উপবীতধারী এক ব্রাহ্মণ চন্দনচর্চিত ফুল-বেলপাতা প্রতিমাকে নিবেদন করবেন এবং তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি মন্ত্র সমবেত মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। সম্পূর্ণরূপে এই পরিবেশটি দেবতা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক ভক্তি আন্দোলন এই ব্যাপারটিকে ভাঙতে শুরু করে। আধুনিক যুগে এই কাজ যাঁরা করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের অন্যতম। তবে তিনি কখনো আন্দোলনের পথে যাননি, কেননা তা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি এক আদর্শ জীবনযাপন করেছিলেন। তাতেই নিহিত ছিল সব সমস্যার সমাধান। বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে তিনি করতেন অন্তরের পূজা। ফলত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তাঁর বিরুদ্ধে রক্ষণশীলরা যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। পালাতে 'ভাণ্ডারী' নামে একটি চরিত্র এদের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ভাণ্ডারী ঈর্ষা ও হিংসার বশবর্তী হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর থেকে তাড়াতে চায়। ঐসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ কিরকম ছিল পালার একটি সংলাপে তা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

"ভাণ্ডারী॥ গদাধর ঠাকুর মন্ত্রতন্ত্রের ধার ধারে না, নিজের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে মায়ের পায়ে দেয়, নিজে খেয়ে মাকে খাওয়ায়। গলায় তাঁর পৈতে নেই। যেখান থেকে যত সন্যিসী আসে, সবার কাছেই সে সাধনপদ্ধতি শেখে। এদের মধ্যে অনেকেই ঠাকুর মানে না। এদের কেউ যদি তাকে ভজাতে পারে, তাহলে কোনদিন দেখব গদাধর ঠাকুর মাকে নদীতে ফেলে দিয়েছে।"

পালাতে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মসাধনার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাঁরই মুখ দিয়ে ঃ "কলিযুগে বেদ-ফেদের কোন দাম নেই গো। কাউকে ধর্মের উঠোন থেকে গলাধাক্কা আর দেওয়া যাবেনি।... ব্রহ্মজ্ঞান পেলে যদি সবাইকার মধ্যে ব্রহ্মকে দেখতে পাই, সে তো খুবই ভাল।"

প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে আজকের দিনের জাগতিক সমস্যার সমাধান খুঁজলে ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, ঐসব শাস্ত্র রচনাকালের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রযুক্ত ছিল। তারপর মানবসভ্যতা এগিয়েছে, সমস্যার ধরন বদলেছে। ঐসমস্ত শাস্ত্র আজ আর সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয় এটা উপলব্ধি করেছিলেন। নইলে তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কখনোই বলতে পারতেন না, প্রাচীন কুসংস্কার একটা বিরাট আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে; এটা ধীরে ধীরে বিরাট আকার ধারণ করে হিন্দুর জীবনীশক্তিকে নিজের চাপে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। পরবর্তী কালে তিনি ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে সার্বজনীন ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই ধর্ম মানুষের জন্য মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে—এমন ধারণাই দিয়েছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা ঐ ধারণার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল, পালাকার এমন ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

মূলত কালীসাধক হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্র ও অদ্বৈত সাধনার পরে ইসলাম এবং খ্রিস্ট ধর্মেও দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর এই কাজ সমকালে আলোড়ন তুলেছিল। সেইসঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আনয়নের কাজও করেছিল। "যত মত তত পথ"-এর উদ্গাতা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এর বিশ্লেষণ দেননি পালাকার। তিনি আসরে অনুপস্থিত, এমন সময়ে তাঁর মা আর হলধারীর কথোপকথনে পালাকার প্রকাশ করেছেন সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা ঃ

"হলধারী॥ একবার মুসলমান হয়ে গেলে আর তুমি তাকে ঘরে নিতে পারবে?

চন্দ্রমণি॥ খিস্টেনকেও এর পরে ঘরে নিতে হবে। মোছলমানকে নিয়ে অভ্যেস করে রাখি।

হলধারী॥ তোমার উঠোনে দাঁড়িয়ে সে নমাজ পড়বে, আর আল্লা আল্লা করবে?

চন্দ্রমণি॥ একই তো মালিক রে বাপু—যে আল্লা, সেই হরি।"

ধর্মের সহজ ও মানবিক ব্যাখ্যা শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন। নরেন যখন অবিশ্বাসী, তখনো তাঁকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখেননি। যুবক নরেন্দ্রনাথকে শিবনাথ শাস্ত্রী দক্ষিণেশ্বরের সাধকের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁর মতে, বিবিধ সাধনা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শরীর ও মনের ওপরে অত্যাচার করেছেন। ফলে মাঝে মাঝে তাঁর মূর্ছাজাতীয় রোগ প্রকট হয়। পালার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ—"আমি এসব বিশ্বাস করি না" বললে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেন ঃ "করতে হবে না তোকে বিশ্বাস। মানুষকে তো মানিস? সেই মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দে।" স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে অবশ্যই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেই বাণী—"জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" ক্রমশ (দুই)